যুগান্তর

তারিখ ... 17-8 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজস্ব আয়ে ৫ বছর : অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এনবিআরের তথ্যের মিল নেই

৪৭ হাজার কোটি টাকার গরমিল

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারের প্রায় ৪৭ হাজার ২২৩ কোটি টাকার রাজস্ব আয়ের হিসাব মিলছে না। গত ৫ অর্থবছরের আদায় করা এই অর্থের অস্তিত্ব স্বীকার করছে না অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দাবি করছে, এ পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়েছে। যথারীতি তা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিজিএ) বলছে, এই অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা হয়নি। এনবিআরের দাবি সঠিক ও বাস্তবসম্মত নয়। এভাবে গত দুই অর্থবছরে এনবিআর অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের দাবি করেছে। কিন্তু খোদ অর্থ মন্ত্রণালয়ই তা মানতে নারাজ। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গত ৫ বছরে রাজস্ব আদায়ের যে খাতভিত্তিক হিসাব দেয়া আছে, তার সঙ্গেও মিল নেই এনবিআরের আদায়ের। আয়ের এই গরমিল নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ট্রেজারিতে টাকা প্রবেশ না করা পর্যন্ত তা রাজস্ব হিসাবে দেখানো উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবে এনবিআর তা দেখাচ্ছে।

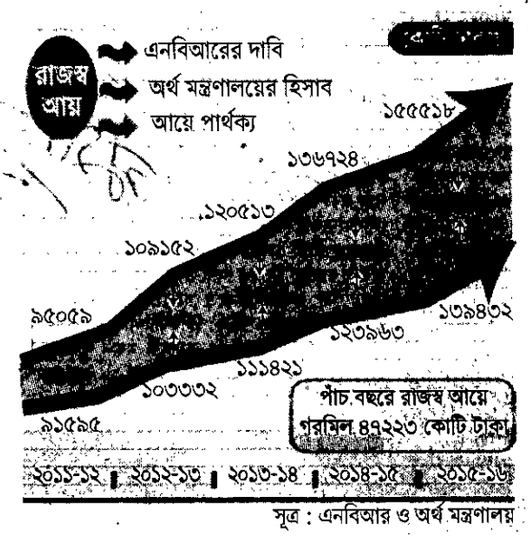

সূত্র : এনবিআর ও অর্থ মন্ত্রণালয়

সূত্রমতে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত এনবিআরের হিসাবে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৭৯ হাজার ৯৬৮ কোটি টাকা। অপরদিকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে আদায় দেখানো হয়েছে ৭৬ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকা। শুধু এই ৭ মাসেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এনবিআরের রাজস্ব পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ৩৫৭১ কোটি টাকা। এরপরের হিসাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নেই। তবে একই বছরের মার্চ পর্যন্ত হিসাবে সিজিএর সঙ্গে এনবিআরের রাজস্ব পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৮৬ কোটি টাকা। জুন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হিসাব হলে এ অংক আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এনবিআর দাবি করেছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি। অথচ অর্থ মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, এই অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব আয় হয়েছে ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা, যা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও দেয়া আছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, গত অর্থবছর এনবিআর যে আয় দেখিয়েছে তার চেয়ে প্রায় ১০ দশমিক ৩ শতাংশ কম টাকা জমা হয়েছে সরকারি কোষাগারে।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে প্রতি বছর সরকারের কোষাগার আর এনবিআরের হিসাবের ফাঁকে যে হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব পার্থক্য— তা কোথায় যাচ্ছে? বাস্তবে এই রাজস্ব জমা হয়েছে? না এনবিআর সাফল্য নেয়ার জন্য কাগজে-কলমে হিসাব মেলাচ্ছে— এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও কোনো জবাব মিলছে না। এনবিআরের সংশ্লিষ্টরা এ নিয়ে কথা বলতে নারাজ।

অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত দুই অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের পার্থক্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এভাবে প্রতি বছরই বাড়ছে রাজস্ব আয়ের এই পার্থক্য। বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুরু করে খোদ অর্থমন্ত্রীও জানেন। হিসাব মেলাতে অনেক বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সমাধান হয়নি কিছুই।

এদিকে রাজস্ব আহরণকারী এবং গ্রহণকারী দুই সরকারি সংস্থার হিসাবের ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

৪৭ হাজার কোটি টাকার গরমিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে ব্যাপক ফারাকের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গত বছর এ দাতা সংস্থাটি বলেছে, এনবিআর ও সিজিএ অফিসের মধ্যে কোনো সমন্বয় না থাকায় রাজস্ব আয়ে গরমিল হচ্ছে। এ প্রবণতা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী, যা গ্রহণযোগ্য নয়। আর্থিক খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত দুই সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ দিয়েছে আইএমএফ।

জানতে চাইলে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমান যুগান্তরকে বলেন, অংকের হিসাব কোনোভাবেই দুই রকম হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে ট্রেজারি চালান, পে-অর্ডার সবই এক জায়গায় জমা হয়। ফলে এই পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, সাময়িকভাবে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। সেটা সর্বোচ্চ ১০ দিনের গ্যাপ। কিন্তু বিগত বছরগুলোর সঙ্গে এই পার্থক্যের কোনো যুক্তি নেই। এরপরও পার্থক্য হলে আমার বিবেচনায় কয়েকটি কারণ। প্রথমত, এনবিআরের কাছে যে টাকা জমা তারা সব টাকা জমা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, মুখে যে টাকার কথা বলছে, অডিটে তার কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। তৃতীয়ত, হিসাবে গরমিল করেছে। এছাড়া তথ্য এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে মাঝে ট্রানজিটে আটকা পড়েছে। তিনি বলেন, যেসব কর্মকর্তা এনবিআরের হিসাবের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কারণ এনবিআরের দয়ার ওপর ছেড়ে দিলে এসব সমস্যা হবেই। এখানে ফাঁকফোকর রয়েছে। তার মতে, দুই প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা রয়েছে।

জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, এত বড় পার্থক্য একটি খারাপ সিগন্যাল। তার মতে, সামান্য কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। কারণ একজন এনবিআরকে চেক দিয়েছে, কিন্তু চেক ক্লিয়ারেন্সের আগেই এটি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে চেক ক্লিয়ারেন্সের আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে সেটি জমা হবে না। এই পার্থক্য হতে পারে দুই-চার দিনের জন্য। কিন্তু একটি অর্থবছর শেষ হওয়ার পর এ ধরনের পার্থক্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এনবিআরকে খতিয়ে দেখা উচিত।

সিজিএর সঙ্গে পার্থক্য মেলাতে এনবিআর একটি কমিটি করেছে। তারা সিজিএর সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছে। এর সঙ্গে জড়িত এনবিআরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। বৈঠকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক যে পরিমাণ রাজস্ব জমা হওয়ার হিসাব দিচ্ছে, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সিজিএ তার সঙ্গে একমত। কিন্তু তা না মেনে এনবিআর নিজ হিসেবেই অটল থাকে। আসলে কেউই দায়দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না। তিনি স্বীকার করেন, এনবিআরের তথ্যের দালিলিক প্রমাণ নেই। সবই কমিশনারদের পাঠানো হিসাব। কিন্তু তা সঠিক কিনা তা যাছাই করা হয় না। তিনি জানান, রিফান্ড বা প্রত্যর্পণের অর্থ রাজস্ব হিসাবে যোগ হবে কিনা এ নিয়েও উভয় প্রতিষ্ঠানেরই মতপার্থক্য আছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরেই রাজস্ব আদায়ের পার্থক্য অনেক বেড়ে গেছে। এর মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত পার্থক্য ১৬ হাজার ৮৬ কোটি টাকা। আর এর আগের অর্থবছরের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৭৬১ কোটি টাকা। এছাড়া গত বছরের মার্চ পর্যন্ত এনবিআরের হিসেবে রাজস্ব আয় দেখানো হয় ১ লাখ ৫ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা। কিন্তু সিজিএ বা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এ সময়ে সরকারের ট্রেজারিতে জমা হয়েছে ৮৯ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা।

এভাবে ৫ অর্থবছরের পরিসংখ্যান বলছে, এনবিআরের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মেলালে মোট ৪৭ হাজার ২২৩ কোটি টাকার হদিস মিলছে না। এ অর্থ আদৌ আদায় হয়েছে কিনা বা আদায় হলে তা কোন হিসাবে জমা হয়েছে তার কোনো তদন্ত আজ পর্যন্ত হয়নি। এ জন্য কারও দায়-দায়িত্বও চিহ্নিত করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী ট্রেজারি চালানের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক মনোনীত রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় সরকারের রাজস্ব জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রত্যেক চালানের হিসাবের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দেয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করে সিজিএ অফিস তা গ্রহণ করে। কিন্তু এ হিসাব না মেলায় প্রতি বছরই সিজিএ এনবিআরে লিখিত আপত্তি জানিয়ে আসছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এনবিআরের হিসাবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা। অথচ সিজিএ হিসাবে তা ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা। এতে এনবিআরের সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের পার্থক্য রয়েছে ১২ হাজার ৭৪৭ কোটি টাকা। আর অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি রয়েছে ১২ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এনবিআরে হিসাবে রাজস্ব আদায় ১ লাখ ২০ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা। পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৪২১ কোটি টাকা। উভয় প্রতিষ্ঠানের হিসাবে রাজস্ব আদায়ের পার্থক্য ৯ হাজার ৯২ কোটি টাকা। আগের অর্থবছর অর্থাৎ ২০১২-১৩ সালে এনবিআরের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব আদায়ের হিসাবের পার্থক্য হচ্ছে ৫ হাজার ৮২০ কোটি টাক। ওই বছরে এনবিআরের হিসাবে রাজস্ব আদায় ছিল ১ লাখ ৯ হাজার ১৫২ কোটি টাকা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে আদায়ের পরিমাণ ১ লাখ ৩ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা, একইভাবে ২০১১-১২ অর্থবছরের হিসাবে দেখা গেছে ৯৫ হাজার ৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে এনবিআর। অপরদিকে ৯১ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা আদায় হিসাব দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। ফলে হিসাবের পার্থক্য দাঁড়ায় ৩ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা।

বলা হচ্ছে, বছর শেষে এনবিআর কাগজে-কলমে রাজস্ব আয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছে। কমিশনারদের পাঠানো তথ্যের সত্যতা যাচাই না করেই তা আমলে নেয়া হচ্ছে। এজন্য অনেক কমিশনার ব্যর্থতা ঢাকতে শতভাগ বা বেশি রাজস্ব আয়ের কৃতিত্ব নেন। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য এবং সিজিএ তথ্যের সঙ্গে এনবিআরের রাজস্ব আয়ের তথ্য মিলছে না। সিজিএ আপত্তি জানিয়ে বলছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজস্ব আদায়ের নির্দিষ্ট হেডে ৩০ জুন পর্যন্ত জমা হওয়া তথ্যের সঙ্গে এনবিআরের তথ্যের কোনো মিলই নেই। এনবিআরের রাজস্ব আয়ের দাবি অনেক বেশি, যা অযৌক্তিক। এ নিয়ে এখন এনবিআরের সঙ্গে সিজিএ দফতরের ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হলেও সুরাহা হয়নি। কোনো পক্ষই একমত হতে পারেনি। এনবিআরের তথ্যের যে ব্যাখ্যা তা গ্রহণ করতে নারাজ সিজিএ। এ নিয়ে দুপক্ষের বিরোধ অনেকটা ওপেনসিক্রেট।

জানা গেছে, গরমিল প্রকৃত কারণ ও এই সমস্যার সমাধান করতে 'সরকারের আর্থিক প্রবাহের মান উন্নয়ন সংক্রান্ত পুনর্গঠিত নামে একটি টাস্কফোর্স' গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এই টাস্কফোর্সের সদস্য এবং অতিরিক্ত মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক (হিসাব) মো. কামরুল আলম যুগান্তরকে বলেন, সরকারের ট্রেজারিতে জমা হওয়া রাজস্ব আয়ের অর্থের হিসাব এক মাত্র সমন্বয় করছে সিজিএ অফিস। এনবিআরের সঙ্গে মিল রেখে কোনো হিসাব করা হয় না। হিসাবে গরমিল থাকার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সরকারের গঠিত কমিটি কাজ করছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, পার্থক্যটি অনেক বড়। এর আগে আমরা দুই প্রতিষ্ঠানের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেছি। গ্রাফ করেও তাদের দেখানো হয়েছে। কিন্তু এনবিআরের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। কখনও তারা বলে আগামী অর্থবছরের জন্য এডভান্স ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে রেখেছি। কিন্তু আগামী অর্থবছরের ট্যাক্স এই বছরে দেখানোর সুযোগ নেই। তিনি বলেন, বিষয়টি উদ্বেগজনক। আর প্রতি বছরই এই পার্থক্য বাড়ছে। দুই প্রতিষ্ঠানের এই পার্থক্য স্বচ্ছতার দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি রাখে।

সিপিডির রিসার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান যুগান্তরকে বলেন, রাজস্ব আয় নিয়ে এনবিআর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সর্বশেষ বছরে এই পার্থক্য প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়কেই সঠিক মনে করছে সিপিডি। কারণ অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা জমা হয়, সেটাই রাজস্ব আয়ের সঠিক হিসাব। তবে এ বিষয়ে একটি সমাধানে আসতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়, এনবিআর এবং কম্পোট্রলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলকে বসে সমাধানের একটি সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয়নি।